বাঁকড়া বিলের বালিহাঁস

মোশাররফ হোসেন খান

কিশোর উপন্যাস

বাঁকড়া বিলের বালিহাঁস

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

বাঁকড়া বিলের বালিহাঁস

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

কিশোর উপন্যাস

বাঁকড়া বিলের বালিহাঁস

মোশাররফ হোসেন খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

বাঁকড়া বিলের বালিহাঁস

মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন -৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
স্বত্ব
লেখক
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ একুশে ফেব্রুয়ারি ২০১৭
মুদ্রণে
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শিল্পী মুকাদ্দিম
মূল্য
৭৫/- টাকা
প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন-৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫, ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন -৯৫৭৪৫৯০

RAKRA BILER BALIHAS : Written by Mosharraf Hossain Khan, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 75.00 US$: 4 **ISBN. 984-70241-0097-0**

www.pathagar.com

অভিমত–১

মোশাররফ হোসেন খান এখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম প্রধান কবি। আমি তাঁকে লেখক জীবনের প্রথম থেকেই নিবিড়ভাবে চিনি ও জানি। তিনি শুধু কবিতাই নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সফল বিচরণশীল একজন লেখক। সার্বক্ষণিক লেখক বলতে যা বোঝায়, কবি মোশাররফ হোসেন খান সত্যিকার অর্থে তাই। আমি তাঁর একজন গুণমুগ্ধ পাঠকও বটে। আমার অনেক চেনা ও জানা কবি মোশাররফ হোসেন খানের প্রতিভার উচ্চতা যে কতখানি তা বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যের বিরলই বটে! আমি সত্যি তাঁর প্রতি অবাক দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারি না। প্রকৃত অর্থে কবি মোশাররফ হোসেন খান আমাদের বাংলা সাহিত্যে এক বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছেন, যা দেখে আমি পুলকিত এবং আনন্দিত হই।

তিনি একজন অত্যন্ত শক্তিমান আধুনিক কবি। কবিতা ছাড়াও তিনি কথাসাহিত্য, গদ্য সাহিত্য, জীবনীগ্রন্থ, বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের খুব সফল একজন লেখক। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আশা করি তাঁর রচিত কিশোর উপন্যাস 'বাঁকড়া বিলের বালি হাঁস' গ্রন্থটিও ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

তাঁর গদ্যের ভাষা সরল-সহজ এবং সুখপাঠ্য। এক নি:শ্বাসে পড়ে ফেলার মতো। জাদুর মতো পাঠককে ক্রমাগত সামনে টানতেই থাকে। এটা হলো কবি মোশাররফ হোসেন খানের ভাষাশৈলী, আঙ্গিক ও রচনার কৌশলগত প্রয়াস। যেটা খুবই উপভোগ্য বিষয়।

আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

– আল মাহমুদ

www.pathagar.com

অভিমত-২

কবি মোশাররফ হোসেন খান কবিতায় যেমন অসাধারণ শক্তিমান, তেমনি শিশু সাহিত্যেও অত্যন্ত সাবলীল। তিনি নদীর স্রোতের মতো সেই সাবলীল ধারায় লেখনীর মধ্য দিয়ে কিশোরদের মন জয় করে আসছেন। এ পর্যন্ত তাঁর অনেক শিশু সাহিত্যে গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই আমার দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়েছি এই ভেবে যে, তিনি এত সুন্দর পরিপাটি ভাষা ও আঙ্গিক কিভাবে আয়ত্ত করেছেন! আমি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে কৌতূহল নিয়ে তাঁর লেখা নিয়মিত পড়ি। আর এক অভাবিত ভালোলাগার রাজ্যে ছুটে যাই। তাঁর লেখা আমাকে সকল সময়ই মুগ্ধ করে। তাঁর লেখা কিশোরদের জন্যও যেমন লোভনীয় ঠিক তেমনি আবার শিক্ষনীয়ও বটে।

কবি মোশাররফ হোসেন খানের গদ্যের ভাষা আমাদের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর উদাহরণ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো–

আমি আশা করি তাঁর রচিত 'বাঁকড়া বিলের বালি হাঁস' কিশোর উপন্যাসটি সমানভাবে পাঠকদের কাছে গ্রাহ্যতা পাবে এবং নন্দিত হবে।

আমি যেমন কবির দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা করি, তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করি সেই সাথে এই গ্রন্থটিরও বহুল প্রচার কামনা করছি।

– অধ্যাপিকা জুবাইদা গুলশান আরা

www.pathagar.com

অভিমত–৩

কবি মোশাররফ হোসেন খানের লেখা আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালীন সময় থেকেই পড়ি। তখনো কবিকে দেখিনি। তবে তাঁর লেখা আমাকে বরাবরই কাছে টানে। আমি মুগ্ধ হয়ে যাই তাঁর জাদুকরি বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিকগত কারুকাজ দেখে। প্রতিটি লেখাই তিনি পরিশ্রমের স্বাক্ষর রাখে, এজন্য তিনিও হয়ে ওঠেন তাঁর লেখার মতো একজন স্বাপ্নিক কবি। কবির কি কবিতা, কি কথাসাহিত্য, কি উপন্যাস কিংবা কিশোর রচনা–সকল ক্ষেত্রেই তিনি সমগ্রের স্রোতের মতো বেগবান এবং গতিশীল। তিনি শুধু লেখার জন্যই লেখেন না। শিল্পের জন্যই কেবল শিল্প তৈরি করেন না, বরং তিনি যাই লিখুন না কেন তার মধ্যেই থেকে যায় শিক্ষা ও জ্ঞানের এক বিশাল ভাণ্ডার। বিশেষ করে তাঁর কিশোর রচনা ক্ষেত্রটির কথা একটু আলাদাভাবে বলা যায়। আমি বহু সাহিত্য পড়ি কিন্তু তাঁর লেখার সাথে অন্য কারোর লেখার কোনো তুলনাই করতে পারি না।

আমাদের শিশু সাহিত্যে রয়েছে কবি মোশাররফ হোসেন খানের এক বিশাল অবদান। এটা কোনোক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর বর্তমান কিশোর উপন্যাসটির মাঝেও সেই আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে আছে। আমি মনে করি এই গ্রন্থটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাবে। এ ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

এ ধরনের রচনা কবির কাছে আমার আরো পাবার প্রত্যাশা রইল। আশা করি তাঁর লেখনীর ধারা অব্যাহত থাকবে।

– ড. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
রাজশাহী।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মোশাররফ হোসেন খান বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান কবি। শুধু কবিই নন, তিনি একাধারে কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিকসহ সাহিত্যের প্রায়ই সকল অঙ্গনে বিচরণশীল সফল একজন লেখক।

বিশেষ করে আমাদের শিশু সাহিত্যে রয়েছে তাঁর বিশাল অবদান। এ পর্যন্ত কবির বহু কিশোরতোষ উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র'-১, 'কিশোর গল্প সমগ্র'-১ ও 'বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য' পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর কিশোর উপযোগী সুখপাঠ্য ভাষাশৈলী পাঠককে সহজেই আকর্ষণ করে। বিষয়বস্তুতেও রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান। যে কারণে তাঁর কিশোরতোষ লেখাগুলি কিশোর ও শুধিমহলে ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

তিনি এ পর্যন্ত অনেকগুলো কিশোর উপন্যাস লিখেছেন। যেগুলো পাঠক মহলে বহুলভাবে পঠিত ও নন্দিত হয়েছে।

তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি থেকে এবার প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর কিশোর উপন্যাস–'বাঁকড়া বিলের বালি হাঁস'। বইটির ভাষা যেমন সরল, সহজ ও সাবলীল তেমনি রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।

আশা করি কবির অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিও সমানভাবে পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

কিশোর উপন্যাস

বাঁকড়া বিলের বালিহাঁস

এক.

ক'দিন থেকে একটানা বৃষ্টি।

বৃষ্টি তো বৃষ্টি।

সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যা নেই। ঝরছে তো ঝরছেই। বৃষ্টির পানিতে ভরে গেছে চারপাশ।

পুকুর-ডোবা, খাল-বিল থই থই করছে।

গতকালও বৃষ্টি ছিল।

তবুও স্কুল মাফ ছিল না।

ছাতা নেই। কি আর করা। ঘরের পেছন থেকে ইয়া বড় এক মানকচুর পাতা কেটে দিলেন মা। বললেন, এটা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাও। মায়ের নির্দেশ বলে কথা।

বাধ্য ছেলের মতো মাহবুব পাতাটি মাথায় দিয়ে বোগলে বইপত্র চেপে ধরে স্কুলে রওনা দিলো।

বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে মানকচুর পাতার ওপর। তার শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে।

কখনো মনে হচ্ছে পাতা ভেদ করে বৃষ্টির ফোঁটা এই বুঝি মাথায় পড়ল।

মাথায় পড়ে পড়ুক।

লুঙ্গিটা ভাঁজ করে কোমরে গিরা দিয়েছে। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ফাঁকা। তাতেও সমস্যা নেই। সারা শরীর ভিজে গেলেও বইপত্র যেন ভিজতে না পারে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি মাহবুবের।

দপ্তরি ঘণ্টা বাজানোর আগেই মাহবুব স্কুলে পৌঁছে গেছে।

পথে হাঁটা নয়, দৌড়াতে হয়েছে।

স্কুলে বারান্দায় পা রেখেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে হাফিয়ে নিলো।

মাহবুবের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ওঠা-নামা করছে।

মানকচুর পাতাটি মাহবুব দূরে ফেলে দিলো না। তার মনে হলো, স্কুল ছুটির পরও এটা কাজে লাগতে পারে।

www.pathagar.com

হলোও তাই।

ঘণ্টা পড়ল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনো নামগন্ধ নেই।

যাদের ছাতা আছে, তারা বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু আটকা পড়ল ক্লাস এইটের মাহবুবের বেশ ক'জন সহপাঠী। তাদের মধ্যে আছে সেলিম, মামুন, হাসান, আহমদ ও আজিজ।

তারা সবাই স্কুল-বারান্দার পিলার ধরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে একই সুরে গাচ্ছে :

ঐ যে আকাশ চোখ জুড়ানো
বিল ছুঁয়ানো নীল
ঐ যে বাতাস হিম ছড়ানো
ঘুম উড়ানো চিল।

কাশবনে বক যায়রে ডাকি
ডানকানা মাছ দেয় যে ফাঁকি।

বাঁশের মাথা পড়ল নুয়ে

www.pathagar.com

ধানের ডগা পড়ল শুয়ে
দমকা হাওয়া বয়,
মেঘের সাথে রোদের আড়ি
নায়ের মাঝি ছুটছে বাড়ি
বৃষ্টি কথা কয়।

হঠাৎ পুকুর কাঁপল দুপুর
মেঘটা খেলো নীল
বৃষ্টির ফোঁটা এমন মোটা
ভাঙল মনের খিল।

ঝমঝমা ঝম বৃষ্টি নামে
মাঠ ভিজিয়ে তবেই থামে।

বৃষ্টি শেষে খুশির কাঁপন
খুকুর মতো অনেক আপন
সবুজ পাতা হাসে,
পদ্মদীঘি ঢেউ টলোমল
রুপোর টাকা ভাসে।

সত্যিই বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটাই যেন রুপোর টাকা।
বৃষ্টির ফোঁটা যখন অঝোর ধারায় ঝরছে, তখন তেমনি মনে হচ্ছে।
মাহবুব একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে আছে।
সেলিম বলল, কিরে! শুধু বৃষ্টি দেখলেই কি চলবে? পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করছে।
মামুন তার সাথে যোগ করল, সত্যিইরে। আর পারছিনে। চল বেরিয়ে পড়ি।
ওদের বাড়িও মাহবুবদের পাড়ায়। ওরা একই সাথে পড়ার সাথী, খেলার সাথী।
ওদের মধ্যে দারুণ মিল। মনে হয় যেন একই পরিবারের ছয়টি ভাই।
মাহবুব বলল, তা যাওয়া যায় বটে। আমার একটা আল্লাহর দেয়া ছাতা আছে।
তা তোরা যাবি কিভাবে? বইপত্র তো ভিজে যাবে।
আজিজ জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর দেয়া ছাতা মানে?

www.pathagar.com

হাসতে হাসতে মাহবুব বলল, হ্যাঁ তাইতো!
সবাই মাহবুবের দিকে তাকিয়ে রইল। মাহবুব হেসে আঙুল উঁচু করে মানকচুর পাতাটির দিকে ইঙ্গিত করল। বলল, দেখ আমার ছাতার কি বাহার। সুন্দর না!
সবাই হেসে উঠলো, তাইতো! তোর মাথায় এত বুদ্ধি!
মাহবুব বলল, বুদ্ধিটা আমার না, মা'র। আব্বা ছাতা নিয়ে সাতসকালেই বেরিয়ে গেছেন। ওদিকে বৃষ্টি। কিন্তু স্কুলে তো আসতে হবে। মা একটা মানকচুর পাতা কেটে এনে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, নাও এটাই তোমার ছাতা। স্কুলে যাও।
ব্যাস, তাই নিয়েই দৌড়। তা আমি না হয় যেতে পারবো, তোরা যাবি কিভাবে?
হাসান বলল, একটা কাজ করি। আমাদের বইগুলো তুই পাতার নিচে আগলে নে। আমরা ভিজতে ভিজতে যেতে পারব।
শেষ পর্যন্ত তাই হলো।
ওদের বইপত্র মাহবুবের কাছে।
বোঝাটা বেশ ভারীই হয়ে গেল। তবু ভালো লাগছে ওর। কারণ নিজেকে মনে হচ্ছে ওপরের ক্লাসের ছাত্রের মতো। তার মধ্যে একটা তৃপ্তি ও ফুরফুরে ভাব কাজ করছে।
ওরা সবাই পরনের লুঙ্গি উল্টো ভাঁজ করে কোমরে কষে বেঁধে নিলো। তারপর দে ছুট।
বৃষ্টিতে ভিজতে ওদের বেশ মজাই লাগছে।
মাথার চারপাশ দিয়ে ঝর্ণার বেগে পানি বয়ে যাচ্ছে। জামা সেঁটে আছে গায়ের সাথে। জেলেরা মাথায় মাছের ডালি নিয়ে যেভাবে ছন্দদোলায় দৌড়ায়, ওরাও ঠিক সেভাবেই তালে তালে দৌড়াচ্ছে।
এভাবে তারা বেশ পথ এসে গেছে।
হঠাৎ থেমে গেল তারা খালের মুখে এসে।
টানা বৃষ্টিতে খালের পানি কিনার ছুঁই ছুঁই।
তার মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি যে পথটুকু, তাও এখন পানির নিচে। হাঁটু তো হাঁটু, কাপড় কোমরের ওপর তুললেও রক্ষা নেই।
কি করবে সবাই ভাবছে।
হাসান বলল, মাহবুব, তুই এখানে অপেক্ষা কর। আমরা নেমে দেখি কি অবস্থা। যদি গলা সমান পানি হয়, তাহলে অন্য ব্যবস্থা। সাবধান! বইপত্র ভেজে না যেন। আমরা চলি।

www.pathagar.com

হাসানের সাথে অন্য সবাই নেমে পড়ল খালের পানিতে। কেবল ওদের বইপত্র নিয়ে এপারে দাঁড়িয়ে আছে মাহবুব।

খালের রাস্তার পানি গলা পর্যন্ত হলো ওদের। ওরা ওপারে যাবার পর মাহবুবের প্রতি নির্দেশ দিলো আহমদ। সে চিৎকার করে বলল, কচুর পাতায় বই ঢেকে মাথার ওপর নিয়ে তুই আস্তে করে রাস্তা পার হ। খবরদার! সাঁতার কাটতে যাসনে যেন। ...

মাহবুব নির্দেশ পালনের জন্য পানিতে নেমে পড়ল। সে সন্তর্পণে পা ফেলছে। মামুন সাবধান করে দিচ্ছে– ওদিকে নয়, ডানে একটা গর্ত আছে, বাঁয়ের দিকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার সোজা আয়।

মাহবুব অতি কষ্টে পানি পার হলো।

ওপরে ওঠার পর সবাই একই সাথে হাতে তালি দিয়ে মাহবুবকে স্বাগত জানালো।

মাহবুবের মুখে তখন বিজয়ের হাসি।

খাল পাড়ে দাঁড়িয়ে ওরা চোখ ফেরালো পেছন দিকে। দেখল খালে শাপলা ফুটে আছে।

কোনোটা সাদা, কোনোটা লাল, আবার কোনোটা ঈষৎ ধূসর। ধূসর বর্ণের শাপলাকে এলাকার মানুষ বলে সন্ধ্যা নাল। বেশ সুগন্ধও বটে।

শাপলাকে ওরা আঞ্চলিক ভাষায় বলে নাল। নাল দিয়ে ওরা নানা ধরনের খেলনা বানায়।

সাদা নালের মাথায় যখন ফুলটা ফলে রূপান্তর হয়, তখন তাকে ওরা বলে ঢ্যাপ। ঢ্যাপ কাঁচা খেতেও বেশ মজা। আবার ভাজি করে খেলেও প্রায় খইয়ের মতো স্বাদ লাগে। স্বাদটার চেয়ে খেলনাটাই ওদের কাছে বড়। খালের রঙবেরঙের নালগুলো ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওরা আর স্থির থাকতে পারল না। মাহবুবকে বলল, তুই এখানে দাঁড়া। আমরা নাল তুলে আনি।

যে কথা সেই কাজ।

ছুটল সবাই নাল তুলতে।

বেশি কষ্ট করতে হলো না।

অল্প চেষ্টাতেই অনেকগুলো নাল তুলে আনল। তারপর হারের মতো গলায় পেঁচিয়ে নিলো। মাহবুবকেও বাদ রাখল না। তার গলায়ও পরিয়ে দিলো রঙিন নালের মালা। এরপর তাদের পথ চলা শুরু হলো আবার।

www.pathagar.com

ততক্ষণে বৃষ্টিটা থেমে গেছে।

কিন্তু পাড়ার কাঁচা সরু রাস্তা হয়ে উঠেছে পিচ্ছিল।

আঙুল টিপে টিপে সামনে সপ্তর্পণে পা ফেলছে তারা। একটু অসতর্ক হলেই ধপাস।

তারপর! তারপর তো কত কিছুই ঘটে যেতে পারে। হাত-পা ভাঙা, কেটে-ছিঁড়ে যাওয়াসহ কত কি!

বৃষ্টির মধ্যে সবুজ দুর্বা ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে অবশ্য মজাই লাগে। কেমন যেন কার্পেটের ওপর দিয়ে সাহেবী মেজাজে পা ফেলা।

কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন সাহেবী অনুভূতি ওদের মধ্যে কাজ করছে না। বরং পেটের মধ্যে মোচড় মারছে ক্ষুধা নামক মস্ত কুয়া।

পুকুর পাড়ে এসে মাহবুবের কাছ থেকে যে যার বই দেখে নিয়ে নিলো।

যাবার সময় বলল, মনে রাখিস, কাল। স্কুল তো ছুটি। সকালেই কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়ব অভিযানে।

মাহবুব বলল, ঠিক আছে। মনে থাকবে। তবে তার আগে কিছু প্রস্তুতি তো নিতে হবে।

হাসান জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

মাহবুব বলল, বুঝলি না! ভেলা বানানোর জন্য কলাগাছ সংগ্রহ করতে হবে। কঞ্চি কাটতে হবে। দড়ি লাগবে। কত কিছু!

আজিজ বলল, কিচ্ছু ভাবিসনে। সব হয়ে যাবে সময়মতো। আমাদের বাগানে কয়েকটি কলাগাছ ভেঙে পড়েছে।

সেলিম বলল, আরে আমাদের বাগানেও আছে। আব্বা গতকাল কলার কাদি কেটে নিয়েছে।

মাহবুব হেসে বলল, তাহলে তো মুশকিল আছান। বাকি থাকলো কঞ্চি কাটা। সেটা আমার ওপর ছেড়ে দে। ঘরের পেছনেই বাঁশবাগান। দা নিয়ে কেবল ওঠার অপেক্ষা। কত কঞ্চি লাগে দেখব।

ঠিক আছে। তো এই কথা!

এরপর যে যার মতো বাড়ি চলে গেল।

মাহবুব উঠোনে পা দিতেই রিজিয়া বেগম ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বইপত্র ভেজেনি তো?

মাহবুব বলল, না মা। মানকচুর পাতাটা আজ দারুণ কাজে লেগেছে।

www.pathagar.com

রিজিয়া বেগম ছেলের হাত থেকে বইপত্র নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছেন, ভিজে গেছে কিনা। না, ভেজেনি। তবে একটু নরম হয়ে গেছে। তিনি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, নিচের ক্লাসের বইপত্র সরকার নিউজপ্রিন্ট কাগজে কেন যে ছাপে! সামান্যতেই নষ্ট হয়ে যায়।

মাহবুবের হাত থেকে বইপত্র নিয়ে তিনি রান্নাঘরে গরম চুলার পাশে রাখলেন। মাহবুবকে বললেন, যাও। পুকুরে গিয়ে দ্রুত গোসল করে আসো। আমি ভাত বেড়ে আনছি।

ছোট্ট বোন ফারিহা বারান্দায় বসে খেলছিল। মাহবুবকে দেখে সেও দারুণ খুশি হলো। বলল, ভাইয়া তো ভিজেই গেছে, আবার গোসল কেন?

মাহবুব মজা পেল বোনের কথায়। তার ক্লান্তিটা যেন দূরে চলে গেল। হাসতে হাসতে সে পুকুরের দিকে পা বাড়াল।

দুই.

পরদিন, শুক্রবার।

সকাল হতেই পুকুর পাড়ে এসে একত্রিত হলো সেলিম, মামুন, হাসান, আহমদ ও আজিজ।

হাসান গলা ছেড়ে ডাক পাড়ল, মাহবুব।.... তাড়াতাড়ি আয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মাহবুব পান্তাভাত খাচ্ছিল।

ভাত খাওয়া শেষে অমনি চুমুক দিচ্ছিল। কলা তরকারির সাথে আবার পেঁয়াজ ও কাঁচা ঝাল মাখিয়ে নিয়েছে। ফলে পান্তার স্বাদটাই অন্যরকম লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে আরও খেতে। কিন্তু ওদের ডাক কানে আসতেই মাহবুব অস্থির হয়ে উঠল। দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে দৌড় দিলো পুকুর পাড়ে।

আহমদ বলল, কিরে কত খাস তুই? খেতে খেতে পেটটা তো কুমড়ো বানিয়ে ফেললি।

হাসান হেসে বলল, আরে ও না খেলে এত বড় কলাগাছ টানবে কেমন করে। নে, ধরতো মাহবুব!

পুরো একটা কলাগাছের দুই মাথা দুইজন ধরল। বাকিরাও নিয়েছে একটা করে। এখন এগুলো বিলের ধারে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বিলপাড়ে বসে ভেলা বানিয়ে তাতে উঠে ভেসে বেড়াবে সারা বিল। অন্তত আজকের দিনে ওদের প্রোগ্রাম তাই।

www.pathagar.com

কলাগাছ বয়ে নিতে তাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

তার মধ্যে আবার মাহবুবের বোন ফারিহা এসে বায়না ধরল, সেও বিলে যাবে। এতটুকু মেয়েকে সাথে নেয়া সহজ নয়, উচিতও নয়।

মাহবুব একটু ধমকের সাথে বলল, যা তো এখান থেকে! মায়ের কাছে থাক।

কেঁদে ফেলল ফারিহা। বলল, আমাকেও সাথে নাও না।

মাহবুব মুখ ভেংচিয়ে বলল, আমাকেও নাও না! ইসরে! কি আমার আবদার। যা! ভাগ এখান থেকে!

সেলিম বলল, ওকে ধমকাচ্ছিস কেন? ভালোভাবে বললেই তো হয়।

মাহবুব বলল, ভালোভাবে বললে শুনবে মনে করেছিস! ও একটা আস্ত বিচ্ছু।

ফারিহা চোখ মুছতে মুছতে দৌড় দিলো বাড়ির দিকে। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে নালিশ দিলো মায়ের কাছে।

রিজিয়া বেগম আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, যাকগে ওরা। তুমি আমার কাছে থাকো।

মায়ের আদরেও মান ভাঙতে চায় না ফারিহার।

মা ফারিহার খেলনার ঝুড়িটা এনে তার সামনে দিয়ে বললেন, নাও। এগুলো দিয়ে খেল। আমি ঘরদোর গুছিয়ে নেই।

www.pathagar.com

খেলনা পেয়ে ফারিহা মেতে উঠল তার আপন ভুবনে। তারও এখন কত কাজ! বর-বউ সাজানো। হাঁড়ি-পাতিল গোছানো, রান্না-বান্না আরও কত কি! ভেলার কথা এখন আর তার মনেও নেই।

বাড়ির পাশেই বিল।

পানিতে থই থই করছে বিলের চারপাশ।

মাঝে মাঝে বাতাস এসে দোলা দিয়ে যাচ্ছে পানির বুকে। আর তখন হালকা মায়াবী ঢেউ দুলে উঠছে।

কলাগাছের পেটের ভেতর দিয়ে বাঁশের কঞ্চি ঢুকিয়ে সোজা করে গাঁথছে ওরা। পাঁচটি কলাগাছের চারটি গাঁথুনিতে বেশ শক্ত হয়ে উঠল ভেলা দুটি।

এরকম দুটি ভেলা বানালো ওরা। একটি ভেলায় তিনজন করে উঠবে।

ভেলা বানানোর কাজ শেষ করে দুটোই রাস্তা থেকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে পানিতে ফেলে দিলো। তারপর লম্বা চিকন বাঁশের লগি হাতে ওরা তিনজন করে উঠে বসল ভেলায়।

বিলের পানিতে ওরা পড়ে গেলেও সমস্যা নেই। কারণ ওরা সাঁতার জানে। দ্বিতীয়ত পানি ওদের বুক কিংবা গলা সমান হবে।

ভেলায় উঠে ওরা লম্বা লগি দিয়ে বিলের পাড়ের মাটিতে জোরে গুঁতো দিলো। এক ধাক্কাতেই ভেলা দুটি বেশ কিছু দূর ভেসে গেল।

এখন তারা ভেলায় ভেসে সারা বিল ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। যতক্ষণ না জুমার আজান শুনতে পায়।

ছয়জনের জুটিটা বেশ ভালোই। যা করে এক সাথে।

খেলাধুলা থেকে শুরু করে সকল কিছুই। পড়াশোনায়ও কেউ খারাপ না। নামাজ-রোজার ব্যাপারেও সবাই সতর্ক এবং সিরিয়াস।

স্কুল থেকে বাড়ি এসে তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় একসাথেই সময় কাটায়। কখনো মাঠ বেড়িয়ে, কখনো হাট ঘুরে, আবার কখনো বা উদাস ভ্রমণে সময় কাটায়। কিন্তু নামাজের সময় হলেই সবাই জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে। এ ব্যাপারে কোনো ছাড় বা অলসতা নেই।

মাহবুবের আব্বা জাফর সাহেব নামাজের জন্য ছেলেকে সব সময় সতর্ক করে দেন। বলেন, নামাজ হলো বেহেশতের চাবি। ঠিকমতো নামাজ আদায় করলে

www.pathagar.com

সকল খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা যায়। ভালো হবার প্রথম শর্তই হলো ঠিকমতো নামাজ আদায় করা।

মাহবুব আব্বার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে।

বাপ-মায়ের মনে কখনো কষ্ট দেয় না।

তাদের অবাধ্য হয় না।

এতে করে সে প্রতিটি ধাপে ধাপে সুফল পায়।

গরমকালে তো ফজরের নামাজ পড়তে কোনো কষ্টই হয় না। কিন্তু কনকনে শীতের মধ্যেও ফজরের নামাজ নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সে আদায় করে। আব্বা-আম্মাই তাকে ডেকে দেন।

আজানের ধ্বনি কানে এলে শুধু মাহবুব কেন, দলের অন্যদেরও সকল কাজকর্ম বন্ধ। তখন তারা ছুটে চলে আল্লাহর ডাকে।

দুটো ভেলায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা ছয়জন।

কারো হাতেই ঘড়ি নেই।

থাকার কথাও নয়।

গ্রামের ছেলে। এতটুকু বয়সে বাপ-মা ঘড়ি কিনে দেন না।

এই বয়সে ঘড়ি হাতে দিয়ে ঘুরে বেড়াতেও ওদের লজ্জা করে।

ঘড়ি নেই, তাতে কি? সূর্যই ওদের ঘড়ি। বেলা দেখেই ওরা বলে দিতে পারে কয়টা বাজে।

তবুও সতর্কতার জন্য মাহবুব বলল, এই খেয়াল রাখিস, আনন্দে মেতে যেন আবার জুমার নামাজ না হারাই।

হাসান হেসে বলল, আরে তুই কি বলিস! সূর্য এখনো পুবে। ঠিক মাথার ওপর আসার আগেই আমরা নেমে যাব।

মামুন বলল, ভেলা দুটো কিন্তু ভাঙা চলবে না। এখন থেকে প্রতি বিকেলেই আমরা ভেলায় ভেসে বিল ভ্রমণ করব।

আজিজ তার সাথে যুক্ত করল, সত্যিই এই ভেলায় ভাসা কি যে মজা! মনে হচ্ছে নৌকা ভ্রমণও এর কাছে তুচ্ছ।

আহমদ আর একটু যোগ করল, নৌকা বলছিস কেন, বল জাহাজ ভ্রমণ।

সবাই একসাথে হেসে উঠল।

মাহবুব বলল, জাহাজ, তবে যে সে জাহাজ নয়, একেবারে টাইটানিক।

www.pathagar.com

আজিজ বলল, দুর কি যে বলিস! টাইটানিক হলে তো ডুবে যাবে। আমাদের এ জাহাজ চির ভাসমান। ডুববে না। মেড ইন বাংলাদেশ।

সেলিম হাসল। বলল, মেড ইন বাংলাদেশ নয়, বল মেড ইন বাঁকড়া। এর সাথে কোনো কিছুরই তুলনা চলে না।

এবার সবাই একযোগে হেসে উঠল।

আহমদ বলল, এই দেখ দেখ! আমাদের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বক কেমন দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে! ইস রে, ধনুকের ছিলার মতো কেমন টানা লাইন। কি যে সুন্দর লাগছে!

মাহবুবসহ সকলেই তাকালো মাথার ওপর।

ততক্ষণে বকের ঝাঁকটি পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেছে। বাঁশবাগান ছাড়িয়ে কারিগরপাড়া, তারপর মালিপাড়া। এবার আরও দূরে চলে গেছে। একেবারেই ছোট লাগছে। যেন বাবুই কিংবা চড়ুই পাখি।

ওরা কোথায় যাচ্ছে?

মাহবুব বলল, নিশ্চয়ই কচুর বিলে।

কিন্তু যেখানেই যাক, একটা ব্যাপার লক্ষ করলি?

আহমদ জিজ্ঞেস করল, কি?

মাহবুব বলল, মিল। ওদের মধ্যে কি দারুণ ঐক্য ও মিল দেখলি? কেউ কাউকে তাড়া করছে না। মারামারি, হাতাহাতি নেই। কেমন একযোগে চলছে। কিন্তু-

- কিন্তু কি? আজিজ জিজ্ঞেস করল।

মাহবুব বলল, কিন্তু দেখ, এই যে মানুষ- মানুষের মধ্যে কি ধরনের গোলমাল, হিংস্রতা, আর রেষারেষি।

আহমদ বলল, তা ঠিকই বলেছিস। আমাদের পাড়ার কথাই ধর না, এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের তেমন মিল নেই।

মাহবুব বলল, এই মিল না থাকার কারণেই কিন্তু যত অঘটন ঘটে। যদি মানুষের মধ্যে মিল থাকত তাহলে বন্ধ হয়ে যেত সকল হানাহানি।

হাসান বলল, আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও যদি ঐক্য থাকত তাহলে আমেরিকা ও ব্রিটেন সাহস করত না আফগানিস্তান কিংবা ইরাকে আক্রমণ করতে।

মাহবুব বলল, সে কথা কি আর বলতে! মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নেই বলেই তো আজ সারা বিশ্বের মুসলমান মার খাচ্ছে।

www.pathagar.com

মাহবুবের কথায় সবাই একমত হলো।
গ্রামের অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই।
পাকা রাস্তা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ চলে গেছে। এখন ঘরে ঘরে টিভি চলে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রও চলে আসে বেলা দশটার মধ্যে।
ওরা সবাই নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে।
বাড়ি থেকে বাঁকড়া বাজার বেশি দূরে নয়।
পাকা রাস্তা।
যখন তখন আসা-যাওয়া করা যায়।
ইরাকে মার্কিনিদের লোমহর্ষক অমানবিক হায়েনাসুলভ অত্যাচার-নির্যাতনের সচিত্র করুণ সংবাদের সাথে তারা নিয়মিত পরিচিত।
মাহবুব বলল, মার্কিনিরা মানুষ নয়। ওরা হিংস্র পশুকেও হার মানিয়েছে।
আজিজ একটু সংশোধন করে বলল, নারে! মার্কিনিদের সকলেই নয়। দেখলি না বুশের যুদ্ধের বিরুদ্ধে খোদ মার্কিনিদের অনেকেই প্রতিবাদ করল!
আজিজের কথায় যুক্তি আছে।
মাহবুব বলল, তবে যাই বলিস না কেন, বুশ-বে-য়ার কিন্তু মানুষের মধ্যে গণ্য হতে পারে না।
আহমদ জিজ্ঞেস করল, তাহলে ওরা কি?
মাহবুব বলল, ওরা শয়তানের বড় ভাই।
সেলিম হেসে বলল, তা যা বলেছিস। মাহবুব, ঐ ছড়াটি একটু শুনিয়ে দে না ভাই!

- কোনটি?
- কেন, ঐযে বুশ-ব্লেয়ার।...
- ও তাই বল।

মাহবুব হেসে লগি দিয়ে ভেলা ঠেলতে ঠেলতে সুর ধরলো। সাথে সাথে বাকিরাও কণ্ঠ মেলালো :

"বুশ-ব্লেয়ার
বেশ প্লেয়ার
রক্ত নিয়ে খেলছে,
মানুষ খেকো
দুইটা টেকো

www.pathagar.com

বুলেট বোমা ফেলছে।

খুনের নেশা
রক্ত নেশা
এমনি কি আর যায়?
পড়লে মুগুর
ক্ষ্যাপা কুকুর
থামে হাজার ঘায়।

আকাশ ফুঁড়ে
জগৎ জুড়ে
উঠছে ঐকতান,
বুশ-ব্লেয়ার
বেশ প্লেয়ার
বিশ্ব শয়তান।

জুতোর বাড়ি
তাড়াতাড়ি
মারো ওদের গালে,
নইলে ওরা
বর্ণচোরা
উঠবে গাছের ডালে।

বুশ-ব্লেয়ার
বেশ প্লেয়ার
চালছো দাবার ঘুঁটি
তাকিয়ে দেখো
জাগছে লাখো
বীর জনতার মুঠি।

www.pathagar.com

খুনের পেশায়
রক্ত নেশায়
হুঁশ হারানো বুশ,
লজ্জা ভুলে
কাপড় খুলে
শূন্যে ভরে ঢুশ।

বুশ-ব্লেয়ার
বেশ প্লেয়ার
যতই মারো ফাল.
বীর জনতা
এই একতা
তুলেই নেবে ছাল।"

একসাথে সুর করে গাওয়া শেষ হতেই তাদের কানে ভেসে এলো জুমআর আজানের সুমধুর ধ্বনি।

মাহবুব বলল, এই বুশ-ব্লেয়ারদের বিরুদ্ধে এখন মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। তা না হলে আমাদের মুক্তি নেই। ঐ যে বকের সারির মতো। হ্যাঁ, বকের সারির মতোই ঐক্যবদ্ধ। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে আমরা যদি সিসাঢালা প্রাচীরের মতো শক্ত-সবল হতে পারি তাহলে কোনো শয়তানই আমাদের পরাজিত করতে পারবে না, বুঝলি!

মাহবুবের কথায় অন্যরাও খুশি। সে যেন তাদের মনের কথাটাই বলছে।

মাহবুব বলল, নে আর নয়। ভেলা কূলে ভেড়া।

সবাই হাতের লগি দিয়ে মাটিতে জোরে গুঁতো মারছে আর কলার ভেলা দ্রুত, খুব দ্রুত রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে।

এক সময় রাস্তার পাশে ভেলা দু'টি ভিড়ল।

নামতে নামতে আজিজ বলল, পেছনে চেয়ে দেখ, আমরা কত পানি পাড়ি দিয়েছি।

মাহবুব হেসে বলল, যা পাড়ি দিয়েছি তার তুলনায় যা এখনো পাড়ি দিতে হবে তার পরিমাণটাই বেশি।

www.pathagar.com

হাসান হেসে বলল, তুই না মাঝে মাঝে দার্শনিকের মতো কথা বলিস।
মাহবুব বলল, তাই! তবে শোন্ বন্ধু আমাদের মনে রাখতে হবে-

"রক্তপাথারে ভেসেছি কত
জীবনের কথা ভাবিনি
বজ্রবৃষ্টি কিংবা ঝড় ঝঞ্ঝা
তবুও আমরা থামিনি।"

মাহবুব বলল, ঠিক বলেছিস। আমরাও থামব না কখনো।
মাহবুবের সাথে একযোগে সবাই হেসে উঠল।
এরপর তারা এক সাথে দলবেঁধে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
মাহবুব বলল, দ্রুত ওঠ। নামাজে যেন দেরি না হয়।
সাথীরা বলল, আশা করি নামাজে দেরি হবে না। জামাতে নিশ্চয়ই শামিল হতে পারবো।
মাহবুব বলল, পারলেই ভালো। পারাটাই উচিত।
ওরা পুকুর থেকে উঠে জুমার নামাজের জন্য দ্রুত গুছিয়ে দৌড় দিলো।
মসজিদে গিয়ে দেখে সুন্নত পড়ছেন সবাই। এখনো খুতবা শুরু হয়নি।
মাহবুবসহ ওরা সবাই দাঁড়িয়ে গেল নামাজের জন্য।

তিন.

বৃষ্টিতে কিছু কষ্ট আছে বটে। যেমন প্রাণ ঘুলে মাঠে খেলা যায় না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাওয়া যায় না।
কিন্তু কষ্টের চেয়ে আনন্দের মাত্রাটা অনেক বেশি।
মাহবুব বৃষ্টির আনন্দটুকু প্রাণভরে উপভোগ করতে এতটুকু ছাড় দেয় না।
সময়মত খাওয়া-দাওয়া, নামাজ, লেখাপড়া এসব তো নিয়মিত কাজ। এর মধ্যে এই বৃষ্টিতে আবার যুক্ত হয়েছে মাছ ধরার নেশা।
নেশা বলতে নেশাই।
আব্বাও কম মাছুড়ে নন। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে ভোলেন না।
মাছ ধরার জন্য বাড়িতে সব রকমের জাল আছে। খ্যাপলা জাল, কৈ-এ জালসহ কত কি! সব জালের নামও মাহবুবের মনে থাকে না। তবে যে জালটি বিশাল লম্বা, জালের ওপর-নিচ আবার পোড়া মাটির কাঠি দেয়া, সেই কৈ-এ জালটি আব্বা যখন সন্ধ্যার সময় বিলে পাততে যান, তখন মাহবুব সাথে থাকবেই।

www.pathagar.com

জাল পাতার সময় তেমন মজা না পেলেও ভোরে যখন সেটা আব্বা তোলেন, তখন মাহবুব খারই হাতে আব্বার সাথে থাকে। জালের খোপে খোপে আটকা পড়ে কৈ, নয়না, টাকিসহ নানা ধরনের মাছ।

আব্বা জাল তুলে আলের ওপর আনেন। তারপর দুই হাঁটুর ওপর রেখে নিপুণ হাতে একের পর এক মাছ ছাড়িয়ে মাহবুবের হাতে ধরা খারুয়ের মধ্যে দেন। জীবিত মাছগুলো খারুয়ের মধ্যে খলবল করতে থাকে। দেখে মাহবুবের বেশ মজা লাগে।

জাফর সাহেব জালের মাছ ছাড়িয়ে জালটি গুটিয়ে রাখেন উঁচু আলের ওপর। দুই পাশে ধানের ক্ষেত।

পানি থই থই করছে। আলের মাঝে মাঝে কেটে সন্ধ্যায় পেতে রাখা ঘুনি এবং চারুই ওঠানোর জন্য এগিয়ে যান আব্বা। মাহবুব সাথে আছে।

ঘুনি বোনা বাঁশের চিকন শলা দিয়ে।

এটা এমন এক কৌশলে বোনা যে, ঘুনির গায়ে তিন-চারটি জায়গা বিশেষভাবে ভেতরের দিকে বসানো। সেই ঘালির মধ্যে আটা-কুড়ো, ভাত মাখিয়ে মণ্ডা পাকিয়ে তার মধ্যে গেঁথে রাখতে হয়। ছোট, বিশেষ করে পুঁটি, মায়া ও চুচড়া

www.pathagar.com

মাছ ঐ খাদ্য খাবার জন্য ঘুনির মধ্যে যায়। সেখানে ঢুকলে আর বেরুতে পারে না।

চারুইটা অবশ্য একটু মোটা শলায় বোনা। তার মধ্যে শামুকের ঘিতে জাতীয় খাদ্য-খাবার ভরে দিতে হয়। টাকি, কৈ, বাইনসহ নানা ধরনের মাছ তাতে ধরা পড়ে।

দৈড় দিয়েও এ সময়ে মাছ ধরা হয়। রাস্তা চিকন করে কেটে ঢালুর পাশে গর্ত করে ছোট-বড় দৈড় পাতা হয়। পানির স্রোতের সাথে মাছ এসে দৈড়ের মধ্যে পড়ে। যেখানে দৈড় পাতা হয়, সেখানে পল, খেঁজুরের বাল্লে প্রভৃতি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, যেন মাছ ছায়াঘন অবস্থায় নির্ভয়ে আসতে পারে। মানুষজনের দেখা পেলে তারা ভয়ে পালিয়ে যায়।

যাতে মাছ পালিয়ে না যায়, সেজন্য এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা।

সন্ধ্যায় দৈড় পাতলে রাতে একবার অন্তত দৈড় তুলে খালি করে নিতে হয়। কারণ এতে এত বেশি মাছ ধরা পড়ে যে দৈড় ভরে যায়।

দৈড় পাতার পর গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে হারিকেন বা ল্যাম্প নিয়ে পাহারা দিতে হয়।

আব্বা গভীর রাত পর্যন্ত দৈড়ের কাছে থাকেন। রাতের পড়া শেষ করে মাহবুব প্রায়ই সেখানে যায়। বাপ-বেটা মাছ নিয়ে ফিরে আসে। আবার ভোরেই ছুটতে হয় দৈড়ের কাছে।

কত ধরনের মাছ যে এ সময়ে ধরা পড়ে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

ধরা মাছ বিক্রির তো প্রশ্নই ওঠে না। নিজেদের মতো রেখে জাফর সাহেব বিলিয়ে দেন পাড়ার প্রতিটি ঘরে।

এই মাছ ধরা এবং বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে কি যে আনন্দ, তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। সে কেবল চাক্ষুষ দেখা, অংশগ্রহণ আর অনুভূতির ব্যাপার।

এ সময়ে পাড়ার সবার হাঁড়িতেই মাছ আছে। মাছের ঝোল, চচ্চড়ি, তরকারির সাথে মাছ। নানাভাবে মাছের ব্যবহার হয়।

বাড়িতে মাছের অভাব নেই। জাফর সাহেব তো বলতে গেলে মাছ ধরার পোকা।

মাহবুবের মধ্যেও পিতার এই অভ্যাসটি দানা বেঁধে উঠেছে।

আব্বার সাথে শুধু খারুই ধরে, কিংবা মাছভর্তি খারুই নিয়ে বাড়ি আসার মধ্যে সে আর আনন্দ পায় না। তার এখন ইচ্ছে হয় মাছ ধরতে।

www.pathagar.com

কি করা যায়?

স্কুল থেকে আসার পথে পরামর্শ করল বন্ধুদের সাথে।

তারা সবাই মিলে ঠিক করল, আজ বিকালে মাহবুবদের ধানের ক্ষেতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় একটা সেঁচাগাড় কাটবে।

সেঁচাগাড়টা আবার একটু অন্য ধরনের প্রক্রিয়া।

ওপর থেকে ঢালুর দিকে, পরিমাণ মতো জায়গা খুঁড়ে লম্বা করে টেনে আনতে হয়। এই খোঁড়া জায়গার শেষ মাথায় বেশ বড় একটা গর্ত করতে হয়। গর্তের পাশ উঁচু করে বেঁধে নিতে হয়, যেন পাশের পানি গর্তে না ঢোকে। এরপর লম্বা করে কাটা নালাটির ওপরও লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। মূল বড় গর্তের নালা-মুখে দৈড় পাততে হয়। এরপর গর্তের পানি গামলা কিংবা পাতিল দিয়ে আস্তে করে কেটে পাশে ফেলতে হয়। এতে করে নালা দিয়ে আসা পানির স্রোতের সাথে মাছও চলে আসে এবং দৈড়ে এসে পড়ে।

এভাবে মাছ ধরার মধ্যেও দারুণ মজা। এটা নীরবে-নিঃশব্দে করতে হয়। তানা হলে কথার আওয়াজ কিংবা মানুষের উপস্থিতিতে মাছ নালার মুখ থেকে ফিরে যেতে পারে।

মাহবুবসহ তার বন্ধুরা সবাই বিকালে কোদাল, বাল্লে আর দৈড় নিয়ে হাজির হয়ে গেল।

কথামতো শুরু হলো প্রথমে নালা কাটার কাজ। তারপর কাটল বড় গর্তটি। নালার ওপর ঢেকে দেয়া হলো বাল্লে দিয়ে।

সবাই এবার নীরব, নিশ্চুপ।

নালা বেয়ে ঝির ঝির স্রোতে পানি আসছে।

স্রোতের মুখে দৈড় পেতে দিলো। এবার গামলা দিয়ে আস্তে করে পানি কেটে খুব সতর্কতার সাথে ফেলছে গর্তের ওপর অন্য পাশে।

মাহবুব প্রথম শুরু করল।

সে ক্লান্ত হবার পর পানি টানার পালা এলো সেলিমের ওপর। সেলিম থেকে মামুন। মামুন থেকে হাসান। এভাবে সবাই পানি টানল।

সন্ধ্যা প্রায় আগত।

দৈড়ের মধ্যে কি পরিমাণ মাছ পড়েছে দু-একবার কৌতূহলবশত তারা দেখল।

খুব বেশি না।

তাতেও তাদের খুশির মাত্রা এতটুকুও কমেনি।

www.pathagar.com

এ তো শুধু মাছ ধরা নয়। এক ধরনের অভিযানও বটে। তার চেয়ে বড় কথা, এতদিন কেবল তারা অন্যের ধরা মাছ বয়েছে এবং খেয়েছে। নিজেদের হাতে ধরা মাছ, যার সাথে রয়েছে নিজেদের শ্রম ও সাধনা–তার তো মজাটাই আলাদা।

অন্যের কাছে হোক না গৌণ বা তুচ্ছ। কিন্তু ওদের কাছে এটা দারুণ এক সম্মানজনক মজার ব্যাপার।

মাগরিবের আজান শোনা গেল।

মাহবুব বলল, আজান হয়েছে। অতএব পানি সেঁচা আপাতত বন্ধ। চল আগে নামাজ আদায় করে আসি।

আজিজ বলল, নারে নামাজের পর আসা যাবে না। আমার পড়াশোনা আছে।

হাসান হেসে বলল, মাছের নেশায় পেয়ে বসলে কিন্তু সাড়ে সর্বনাশ।

আজিজ কৌতুক করে বলল, 'মৎস্য মারিব খাইবো সুখে, লেখাপড়া শিখিলে মরিবো দুখে।'

আজিজের কথা শুনে সবাই একযোগে হেসে উঠল।

মাহবুব বলল, নে ঢের হয়েছে। এখন নালার মুখে কাদা দিয়ে ভালো করে বেঁধে দে তো। যাতে পানি গর্তে পড়তে না পারে। আমরা এসে যদি গর্তভরা পানি পাই তাহলে তা সেঁচতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।

আহমদ কাদা দিয়ে নালার মুখটা ভালো করে বেঁধে দিলো।

সেলিম এবার দৈড়টা টেনে তুলল। না! মাছ নেহাত কম পড়েনি।

দৈড়ের মধ্যে ছোটবড় টাটকা রূপালি মাছের কলবল শব্দে ওদের প্রাণে আনন্দের তুফান উঠল।

সেলিম বলল, নে চল। যাওয়া যাক।

দৈড়, কোদাল, গামলা নিয়ে ওরা বাড়ির দিকে রওনা দিলো।

মাহবুব বলল, মাগরিবের পরে নয়, বরং লেখাপড়া শেষ করে রাতে খেয়ে দেয়ে তারপর আসব।

মামুন বলল, সে তো বুঝলাম। কিন্তু দৈড়ের এই মাছগুলোর কি হবে?

মাহবুব জিজ্ঞেস করল, কেন?

সেলিমও বলল, ঠিকই তো। মানুষ আমরা ছয়জন। মাছ মাত্র এগুলো। এর ভাগ করবে কি? আবার একজনেরও তো দেয়া যায় না। পরিশ্রম আমরা সবাই করেছি। সুতরাং এতে হক আছে আমাদের সকলেরই।

www.pathagar.com

আজিজ বলল, হক কথা।
মাহবুব হেসে বলল, তাহলে এক কাজ করি। মাছগুলো আমি নিয়ে যাই।
মামুন বলল, কি বললি? এই কি তোর ইনসাফ!
হাসান বলল, আরে আগেই ক্ষেপছিস কেন। ওর কথা শেষ করতে দে।
সেলিম বলল, ঠিক আছে। মাহবুব বল। তারপর?
মাহবুব বলল, তারপর– আমার মা এগুলো এখন ঝোল করবেন। আর আমরা সবাই একসাথে খাবো। হাজার হোক আমাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ধরা মাছ। দেখিস একসাথে খেতে কি মজাটাই না লাগে।
আহমদ বলল, গুড আইডিয়া! আমিও এমনটিই ভাবছিলাম।
মাহবুবের কথায় সবাই রাজি হয়ে গেল।
মাহবুব বাড়ির কাছে এসে বলল, তাহলে কথা এটাই থাকল। মাগরিবের নামাজ আদায় করে আমরা ক্লাসের পড়া শেষ করব। তারপর তোরা চলে আসবি সোজা আমাদের বাড়িতে। রাতের খাওয়া একসাথে হবে। তারপর হারিকেন নিয়ে আমরা আবার ওখানে যাব। কাল তো শুক্রবার। স্কুল বন্ধ। রাতের ঘুমটা প্রয়োজনে কাল দিনে পুষিয়ে নেব।
আজিজ জিজ্ঞেস করল, কিন্তু চাচা আবার রাগ করবেন নাতো?
মাহবুব বলল, আরে না। তিনি বরং আরও খুশি হবেন। আমার আব্বাকে তোরা চিনিস নাতো! তিনিও দারুণ মাছুড়ে। দেখিস হয়তো আমাদের সাথেই চলে যাবেন।
সময় কম। নামাজের জন্য ওদের ব্যস্ততা বেড়ে গেল।
সবাই দ্রুত তৈরি হয়ে মসজিদে উপস্থিত হলো।
নামাজ শেষে মাহবুব বলল, জানিস, মাছ দেখে মা তো একেবারে থ! আমরা যে কষ্ট করে ধরেছি তাতে তিনি দারুণ খুশি।
আজিজ জিজ্ঞেস করল, আর তোর আব্বা?
মাহবুব বলল, তিনি তো এখনো হাটে। হাট থেকে আসবেন তবে তো জানবেন।
হাসান জিজ্ঞেস করল, তাহলে খাবার প্লানটা ঠিক আছে তো?
মাহবুব বলল, ঠিক নেই মানে? শুনে তো মা বেজায় খুশি। কম কথা, আমার বন্ধুরা খাবে!
মাহবুবের কথায় ওরা সবাই হেসে উঠল।
একরাশ আনন্দ আর খুশি নিয়ে ওরা যে যার বাড়িতে চলে গেল।

www.pathagar.com

চার.

মাহবুবের নানা আক্কাস শেখ।

বাড়ি সেই দাদপুর।

বয়স চার কুড়ির ওপরে। হলে কি হবে! এখনো তার স্মৃতিশক্তি টনটনে।

ব্রিটিশ পিরিয়ডে মেট্রিক পাস। বাংলা, ইংরেজি আর ইতিহাস এখনো তার নখদর্পণে।

বয়সের ভারে নানা কিছুটা কুঁজো হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যটা বেশ আছে। হবে না! আগের দিনে খাদ্য-খাবার ছিল সবই টাটকা। ঘি, দুধ আর ফল-ফলারির কোনো অভাব ছিল না। এই বয়সেও নানা ভালই খেতে পারেন। রোগ-ব্যাধিও তার কম।

অনেক দিন পর নানা বেড়াতে এলেন।

নানার আগমন মানেই বাড়িতে একটি ছোটখাটো উৎসব।

গান-গজল, গল্প তো আছেই, বাড়তি পাওনা হলো তার পুঁথি পাঠ।

নানা এত সুন্দর সুর করে পুঁথি পাঠ করেন যে, একজন ব্যস্ত পথিকও থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

আব্বা আগেই নিষেধ করে দিয়েছেন, নানাকে যেন বেশি বিরক্ত না করে কেউ।

কেউ মানে আর কে?

মাহবুব আর তার বন্ধুরা।

কিন্তু আব্বার শাসন খুব একটা কাজে এলো না।

সন্ধ্যার পর ক্লাসের বইপড়া শেষ হলেই অন্য বন্ধুরা এসে হাজির।

এখন শীতের শুরু হলেও তেমন শীত নেই।

সন্ধ্যার পর চাঁদের মিষ্টি আলোয় হেসে উঠেছে গ্রাম, মাঠ, উঠোন সব সবকিছুই।

ওরা আসার পরই মাহবুব বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে বিছানা পেতে দিলো।

কচি দুর্বা ঘাসের ওপর পাটি। তার ওপর বসতেই শহুরে সোফার মতো কিছুটা দেবে গেল।

বসতে দারুণ আরাম।

মাহবুবসহ ওর বন্ধুরা গোল হয়ে বসে গেছে। মাঝখানে নানা।

এতবড় মজমা থেকে ফারিহাও বঞ্চিত হতে চায় না। সেও গুটিশুটি মেরে বসে আছে।

www.pathagar.com

নানার কাছে আবদার করল হাসান, আজ তাদেরকে পুঁথি শোনাতে হবে।
পুঁথির কথা শুনে নানা খুশি হলেন। কারণ আজকের দিনে ঐতিহ্যবাহী পুঁথি পাঠের আসর একেবারেই হারিয়ে গেছে। এ নিয়ে নানার মধ্যে আফসোসের কোনো কমতি নেই।

হাসানের দাবির সমর্থনে মাহবুবসহ অন্য বন্ধুদের গলাও একত্রিত হলো।
নানা এখন চোখে খুব ভালো আর দেখতে পান না। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ অনেক পুঁথি তার মুখস্থ। দেখে পড়ার কোনো প্রয়োজনই হয় না।
নানা পুঁথির সুর তোলার আগে বললেন, মাঝখানে হারিকেন না থাকলে পুঁথি পাঠের কোনো মজাই পাওয়া যায় না।
মাহবুব বলল, দৌড় দিয়ে আনি?
আজিজ বলল, আজকের চাঁদটাই বড় হারিকেন। আপনি শুরু করুন নানা ভাই।
নানাভাই সুর তুলতে গিয়ে আবার একটু থামলেন। বললেন, না, হারিকেন আনো। তা না হলে তাল উঠছে না।
মাহবুব হারিকেন আনল।
নানা আবার বললেন, আমারও একটা দাবি আছে তোমাদের কাছে।

www.pathagar.com

ওরা জিজ্ঞেস করল, সেটা কি? নানা বললেন, আজকে আমি তোমাদের পুঁথি শুনাবো, তার সাথে আমাদের এই বাংলার একজন বীর সৈনিকের জীবনগাঁথা আছে। আছে তার বিশাল এক ইতিহাস। পুঁথির সাথে তার সম্পর্কেও কিছুটা বলবো, সেটা শুনতে হবে এবং তেমনটি হবার জন্য তোমাদের চেষ্টা করতে হবে।

ওরা সবাই বলল, ঠিক আছে নানা, তাই হবে। আপনি শুরু করুন।

নানাভাই বললেন, তাহলে শুরু করা যাক।

নানাভাই গলায় সেই দরদী সুর তুলে মুখস্থ পুঁথি পাঠ শুরু করলেন :

"মহরমে এমাম হাছেন হোছেনের।।
হায় জারি ছিল মশরেক গণের।
পাঁচপীরের নামেতে মোকাম উঠাইয়া।
উপবাস করিত সে সকলে মিলিয়া।
.....
সেসব বেদাত এবে হইল মেছমার॥
উঠিল এছলামি সূর্য গগন মাঝার।
হাজি শরীয়তুল্লাহ হেথা তশরিফ আনিয়া॥
দীন জারি করিলেন বাঙ্গালা জুড়িয়া।"

নানাভাই এই পর্যন্ত পড়ে একটু থামলেন। বললেন, আগের মতো এখন আর দমের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই ভাই! একটুতেই হাঁফিয়ে উঠি।

মাহবুব বলল, তাহলে থাক নানা।

অন্যরা বলল, না। আর একটু।

নানা আবার শুরু করলেন।

এবার বেশ কিছুক্ষণ একটানা পুঁথি পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন, জানো এটা কোন্ পুঁথি? এটা হলো ফরায়েজী আন্দোলন নিয়ে কৃষক কবিদের পুঁথি।

ফরায়েজী আন্দোলন? সেটা আবার কি? মাহবুবসহ সকলেরই জিজ্ঞাসা।

নানা এবার পুঁথি থেকে ফিরে এলেন ইতিহাসে। বললেন, তাহলে শোনো।

নানা মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলতে শুরু করলেন,

www.pathagar.com

সতেরো শো একাশি সাল।

দিনটির কথা কেউ আর বলতে পারে না। এই বছরের কোনো একদিনে হাজী শরীয়তুল্লাহ জন্মলাভ করেন। গ্রামের নাম শামাইল।

গ্রামটি ছিল বর্তমান মাদারীপুর জেলার বাহাদুরপুরের অন্তর্গত।

শরীয়তুল্লাহর আব্বার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। তার জন্ম হয়েছিল একটি প্রখ্যাত জমিদার পরিবারে। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তার নাম-ডাক ছিল চার দিকে। তিনি ছিলেন যেমনি ভদ্র, তেমনি দয়ালু। এ কারণে সবাই তাকে ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে।

আবদুল জলিল ছিলেন একজন প্রজাবৎসল তালুকদার।

অন্যান্য তালুকদারের মতো তিনি সাধারণ প্রজাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাতেন না। শোষণের কুড়াল মারতেন না প্রজাদের মাথায়। তিনি ছিলেন তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

সাধারণ প্রজাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে আবদুল জলিল নিজেকেও যুক্ত করতেন। শরিক হতেন তাদের ব্যথা-বেদনার সাথে। সমবেদনা জানাতেন। সাহায্য করতেন সাধ্যমতো।

এজন্যে তার নামটি ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দূর পর্যন্ত। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। সম্মান দেখাতো।

শরীয়তুল্লাহ এই বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

আবদুল জলিল তালুকদার চেয়েছিলেন তার ছেলেও হবে মানুষের মতো মানুষ। সে হবে শিক্ষিত এবং আদর্শবান। সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে সে।

শরীয়তুল্লাহ শৈশবে বর্ণজ্ঞান লাভ করেন তার পরিবারের কাছে। তারপর গ্রামের মক্তবে।

পিতার ইচ্ছে ছিল শরীয়তুল্লাহর শিক্ষা জীবনের সফলতা নিজের চোখে দেখে যাবেন।

কিন্তু তিনি সে সময় আর পাননি। শরীয়তুল্লাহ এবং এক কন্যা সন্তানকে শিশু অবস্থায় রেখে ইন্তেকাল করলেন আবদুল জলিল তালুকদার।

আবদুল জলিল তালুকদারের ছিলেন আরো দুই ভাই।

এক ভাইয়ের নাম মুহাম্মদ আজিম। তিনি শামাইল গ্রামেই থাকতেন।

www.pathagar.com

অপর ভাই মুহাম্মদ আশিক। থাকতেন মুর্শিদাবাদ। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে মুফতি ছিলেন। তিনি ছিলেন মস্তবড় এক আলেম।

পিতার ইন্তেকালের পর বালক শরীয়তুল্লাহর লালন-পালন এবং শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন আপন চাচা মুহাম্মদ আজিম। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

মুহাম্মদ আজিম আপন সন্তানের মতোই আদর-যত্নে লালন করছিলেন শরীয়তুল্লাহকে। অসীম স্নেহ আর ভালোবাসায় তিনি ভরে দিতেন শরীয়তুল্লাহর শিশু মনকে।

কিন্তু শরীয়তুল্লাহর শিক্ষার ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তখন গ্রামে ছিল না ভালো কোনো স্কুল, মাদ্রাসা। ছিল না তেমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং শিক্ষা লাভের জন্যে তাকে অবশ্যই দূরে কোথাও যেতে হবে।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?

ভাবেন কিশোর শরীয়তুল্লাহ।

সেলিম জিজ্ঞেস করল, তারপর?

নানা আবার বলতে শুরু করলেন। শোনো–

শিক্ষার প্রতি ছিল বালক শরীয়তুল্লাহর অদম্য আগ্রহ।

এই আগ্রহের কারণে অল্প বয়সেই শরীয়তুল্লাহ পাড়ি জমালেন কলকাতা।

তার এই সিদ্ধান্তে চাচা আজিমও খুব খুশি হলেন। তিনিও চান মানুষের মতো মানুষ হোক আদরের শরীয়তুল্লাহ।

নানা মাথা চুলকিয়ে বললেন, সালটি ছিল সতেরো শ' তিরানব্বই।

কলতাকায় গিয়ে শরীয়তুল্লাহ ওঠেন মওলানা বশারত আলীর কাছে।

মওলানা বশারত আলী ছিলেন এক মস্তবড় আলেম। ছিলেন দীনদার।

বালক শরীয়তুল্লাহর শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ দেখে তিনি খুব খুশি হলেন।

অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে তিনি শরীয়তুল্লাহর সামনে তুলে ধরলেন শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রদীপ।

শরীয়তুল্লাহও ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও মেধাবী। ভদ্রতা ছিল তার সকল সময়ের ভূষণ। একাগ্রতার সাথে তিনি মওলানা বশারত আলীর কাছে পড়তে থাকলেন।

লেখাপড়ায় মনোযোগ এবং তার চরিত্র-মাধুর্যে মোহিত হয়ে মওলানা বশারত আলী এই প্রিয় ছাত্রের লেখাপড়ার যাবতীয় দায়িত্বভার তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।

www.pathagar.com

শরীয়তুল্লাহকে তিনি পরবর্তীতে ভর্তি করে দিলেন হুগলী মাদ্রাসায়।
মাদ্রাসাটি ছিল হুগলীর ফুরফুরায়।
একবার কি হয়েছে জানো!
কলকাতায় মওলানা বশারত আলীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করার সময় শরীয়তুল্লাহ মুর্শিদাবাদ গেলেন। সেখানে থাকেন চাচা মুফতি মুহাম্মদ আশিক। চাচার সাথে সাক্ষাৎ করলেন শরীয়তুল্লাহ।
এরপর থেকে তিনি প্রায়ই যেতেন চাচার কাছে। হৃদয়ের টানে।
চাচা ছিলেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ।
বহুদিন হলো আপন মাতৃভূমিতে আসার সুযোগ পাননি তিনি।
এর মধ্যে শরীয়তুল্লাহর ওপর দিয়েও গড়িয়ে গেছে অনেকটা সময়।
তিনিও অনেকদিন যাবত গ্রামছাড়া।
যোগাযোগ নেই গ্রামের সাথে। গ্রামের মানুষ আর অবারিত সবুজের সাথে। গ্রামে ফেরার জন্য তাই মনটা তার কেবলই আনচান করে ওঠে।
চাচা মুফতি আশিক একদিন শরীয়তুল্লাহকে বললেন, চলো আমরা বাড়ি থেকে একবার বেড়িয়ে আসি।
কথাটি শোনার সাথে সাথে শরীয়তুল্লাহর চোখে আপন বাস্তুভিটার ছবিটা ভেসে উঠল। তার হৃদয়টা দুলে উঠল মুহূর্তেই। তিনি রাজি হয়ে গেলেন চাচার কথায়। মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা হলেন তারা।
নৌকাযোগে আসছেন নিজ গ্রাম-ফরিদপুরের শামাইলে। সাথে ছিলেন চাচা ও চাচী।
নৌকা চলছে গঙ্গার বুক দিয়ে। পানি কেটে কেটে।
প্রমত্তা গঙ্গা।
তার ওপর আকাশে মেঘ এবং ঝড়ের পূর্বাভাস। ওলোট-পালোট বাতাস।
তবুও নৌকা চলছে শাঁ শাঁ গতিতে।
হঠাৎ শুরু হয়ে গেল গঙ্গার বুকে ঝড়ের দাপাদাপি।
মুহূর্তে যাত্রী বোঝাই নৌকাটি তলিয়ে গেল গঙ্গার বুকে। হারিয়ে গেলেন চাচীজান। হারিয়ে গেলেন চাচা। হারিয়ে গেলেন একজন বিখ্যাত আলেম-মুফতি আশিক।
গঙ্গা তখনো ফুঁসছে ক্রমাগত। গঙ্গার সেই ভয়ালো ঝড় আর ঢেউকে উপেক্ষা করে সাঁতরিয়ে কূলে উঠে দাঁড়ালেন শরীয়তুল্লাহ।

www.pathagar.com

অলৌকিক ব্যাপার বটে!

প্রাণে বেঁচে গেলেন তিনি।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে শুকরিয়া জানালেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে।

কূলে উঠে তিনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলেন।

কেঁপে উঠল তার বুক।

শূন্যতায় ভরে গেল তার কোমল হৃদয়।

কূলে দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গার বুকে খুঁজে পেলেন না কোথাও চাচা, চাচী এবং সেই নৌকাকে।

ফরিদপুর আর আসা হলো না শরীয়তুল্লাহর। দেখা হলো না আর মাতৃভূমি শামাইল।

এক বুক বেদনা আর স্বজন হারানোর কষ্ট নিয়ে তিনি আবারো ফিরে গেলেন কলকাতায়। ফিরে গেলেন প্রিয় শিক্ষক মওলানা বশারত আলীর কাছে।

শরীয়তুল্লাহর মুখ থেকে সব কথা শুনলেন মওলানা বশারত আলী।

শুনলেন তার স্বজন হারানো বেদনার কথা। নৌকাডুবির কথা। তিনি শুনলেন শরীয়তুল্লাহর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার কথা।

সব কথা শোনার পর মওলানা বশারত আলী অবাক হলেন।

তিনি শরীয়তুল্লাহকে আরো বেশি আদর-স্নেহে কাছে টেনে নিলেন।

সতেরো শ' নিরানব্বই সাল।

মওলানা বশারত আলী মক্কায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মক্কায় যাবেন তিনি নবীজীর (সা.) পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারত করার জন্য।

শরীয়তুল্লাহকে সাথে নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন তিনি।

শরীয়তুল্লাহ এ খবর শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

কী সৌভাগ্য তার!

এক অলৌকিকভাবে তাঁর মক্কা যাবার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। তিনি ভাবতেই পারেননি এত সহজে মক্কায় যেতে পারবেন।

আল্লাহর কুদরত ও রহমতের তিনি শুকরিয়া জানিয়ে রাজি হয়ে গেলেন। রাজি হয়ে গেলেন মওলানা বশারত আলীর প্রস্তাবে।

কিছুদিনের মধ্যেই শরীয়তুল্লাহ তার প্রিয় শিক্ষক মওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলেন।

www.pathagar.com

মওলানা বশারত আলীর সাথে মক্কায় আসার পরে হাজী শরীয়তুল্লাহর বুকটা আনন্দে ভরে উঠল।

তার ছিল শিক্ষার প্রতি অসম্ভব আগ্রহ। তিনি মক্কাতেও শিক্ষালাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

শরীয়তুল্লাহ মক্কায় ছিলেন একটানা বিশ বছরের মতো। অনেক দীর্ঘ সময়।

এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মক্কার বিখ্যাত শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করলেন। কিতাবী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ইসলামের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ করলেন।

আপন সাধনা ও শ্রমের বলে হাজী শরীয়তুল্লাহ একজন উচ্চ শিক্ষিত আলেম হিসেবে সুদূর মক্কাতেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

বাংলাদেশ থেকে মক্কা অনেক- অনেক দূরের পথ।

একটি ভিন্ন দেশ। ভিন্ন তাদের ভাষা। ভিন্ন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি।

কিন্তু তা হলে কি হবে?

হাজী শরীয়তুল্লাহর খ্যাতি তখন মক্কার চার দিকে।

ইসলাম সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্যের কথা সবার মুখে মুখে। তার জ্ঞানের বহরের কথা মক্কার শিক্ষিত মানুষমাত্রই জেনে গেছে।

সেখানকার মানুষ হাজী শরীয়তুল্লাহকে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কার বিশ বছর অবস্থান করার সময়ে বেছে নেন শিক্ষকতার মহান পেশা।

তিনি মক্কার নামী-দামি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে থাকেন। এতে করে তার সময়টা ভালোই কাটাছিল। আরো বৃদ্ধি হচ্ছিল তার জ্ঞানের বহর।

এই সময়ে তিনি সন্ধান পেলেন মক্কার আর এক বুজর্গ ব্যক্তির।

তার নাম মওলানা তাহের চোম্বল। মক্কায় তিনি ছোট আবু হানিফা নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ এই বুজর্গ আলেম মওলানা তাহের চোম্বলের কাছে প্রায়ই যেতেন।

মওলানা তাহের মক্কায় একজন আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ও সংস্কারক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তার চরিত্র মাধুর্যে এবং তাঁর শিক্ষা ও সংস্কারে মুগ্ধ হয়ে হাজী শরীয়তুল্লাহও তার কাছে বাইয়াত করেন।

www.pathagar.com

মক্কায় বিশ বছর অতিবাহিত করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
এ সময়ের মধ্যে তিনি একাধিকবার হজ্বব্রতও পালন করেছিলেন।
নানা মাহবুবকে বললেন, পান গালে না দিলে যে আর পারছিনে নানু ভাই!
মাহবুব দৌড় দিলো বাড়িতে। নানার জন্য বাটা পান রেডি করে রেখেছেন মা। দ্রুত এনে নানাকে দিলো।
নানা পান মুখে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন–
মক্কায় থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান এবং মওলানা তাহের চোম্বলের কাছে ইসলাম ও আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে থাকেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
কিন্তু স্বদেশে ফেরার জন্য তার হৃদয়ে ব্যাকুলতা শুরু হয়ে গেল।
কেবলই মনে পড়তে থাকল তার আপন মাতৃভূমির কথা। স্বজনদের কথা। প্রিয় চাচার কথা।
চাচা মুহাম্মদ আজিমের অসুস্থতার খবরও তিনি পেয়ে গেছেন।
এসব কথা ভাবতে গিয়ে মক্কার প্রবাস জীবনে অস্থির হয়ে ওঠেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
সিদ্ধান্ত নেন মক্কা থেকে ফিরে আসার।
অবশেষে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশের মাটিতে।
তখন আঠারো শ' আঠারো সাল।
হাজী শরীয়তুল্লাহ দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে যখন নিজ গ্রামে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন তার একমাত্র জীবিত চাচা মুহাম্মদ আজিম তালুকদার ভীষণ অসুস্থ।
প্রিয় চাচার এই করুণ অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।
খুব শৈশবে গ্রাম ছেড়েছিলেন শরীয়তুল্লাহ। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে তখনকার সেই পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে অনেককেই আর দেখতে পেলেন না।
এর মধ্যে হারিয়ে গেছে তার অনেক খেলার সাথীও। এই বেদনা শরীয়তুল্লাহকে খুব ব্যথিত করে তুলল।
কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশি ব্যথিত হলেন চার পাশের মানুষ ও তাদের পরিবেশ দেখে।
অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অভাব দারিদ্র্য আর শোষণ নির্যাতনে মুষড়ে পড়া মুসলিম পরিবারগুলোর দিকে তাকাতে পারেন না হাজী শরীয়তুল্লাহ।
চার দিকেই আঁধারের কালো ছায়া।

www.pathagar.com

এদেশ তখনো ইংরেজদের দখলে।
ইংরেজের শোষণ আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রাম ও শহরের মানুষ।
শুধু ইংরেজ নয়, এদেশের হিন্দু জমিদাররাও তাদের অত্যাচারের বিষে জর্জরিত করছে সাধারণ মুসলমানকে।
সে সময়ে গ্রামের অধিকাংশ মুসলমানই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দিত না একদিকে ইংরেজ ও অপরদিকে এদেশীয় হিন্দু এবং হিন্দু জমিদাররা।
অসহায় দরিদ্র মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। একটু যারা শিক্ষিত তারাও ছিল অনেকটা অসচেতন।
ইংরেজরা হিন্দু ও হিন্দু জমিদারকে খুব সুনজরে দেখতো।
হিন্দুদের তারা খুব কদর করত।
আর মুসলমানরা ছিল তাদের দু'চোখের বিষ। তারা এদেরকে শত্রু ভাবত। তাই তারা সুকৌশলে হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলতো দরিদ্র অশিক্ষিত মুসলমানদের ওপর।
হিন্দুরা ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমানদের গ্রাস করতে উদ্যত হতো। তারা গ্রাস করত মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ, জমি-জায়গা। তাতেও তারা খুশি হতো না। এরপর তারা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ধ্বংস করার চেষ্টা করত।
ইসলাম থেকে, তাদের ঐতিহ্য থেকে দূরে রাখার সকল প্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করত হিন্দুরা। তাদের হাতে ক্ষমতা আর অর্থ থাকার কারণে তারা সহজেই প্রভাবিত করতে পারত দরিদ্র-অশিক্ষিত মুসলমানদের।
হাজী শরীয়তুল্লাহ দেখলেন মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা।
তিনি দেখলেন, মুসলমানরা রোজা-নামাজসহ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে, আপন সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে হিন্দুদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা নামেই কেবল মুসলমান আছে। তাদের মধ্যে নেই ইসলামের কোনো ছায়াচিহ্ন। ইসলামের কোনো কিছুই তারা পালন করে না। দীর্ঘকাল হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে হিন্দুয়ানি আচার-অনুষ্ঠান ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ইসলামের যে মৌলিক ও পৃথক সংস্কৃতি বলে কিছু আছে– এ কথাও তারা ভুলে গেছে।
তাদের এই অধঃপতন দেখে খুবই মর্মাহত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।

www.pathagar.com

তিনি পথভোলা মানুষের কাছে নতুন করে ইসলামের দাওয়াত দেবার প্রয়োজনবোধ করলেন।

এই বোধ থেকেই তিনি শুরু করলেন দাওয়াতি তৎপরতা।

মানুষকে আহ্বান জানান তিনি সত্যের দিকে। আল্লাহর দিকে। সাধারণ মুসলমানকে তিনি বোঝান ইসলামের আকিদা, বিশ্বাস। বোঝান ইসলামের সুমহান আদর্শ ঐতিহ্য। বোঝান সত্য-মিথ্যার পার্থক্য।

কিন্তু আফসোস!

গ্রামের মুসলমানরা তখন এতটাই অন্ধকারে ডুবেছিল যে, শরীয়তুল্লাহর শত আহ্বানেও তারা এতটুকু সাড়া দেয়নি। তারা চিনতে ভুল করল সত্য পথ। বুঝতে ভুল করল হাজী শরীয়তুল্লাহকে।

অন্ধ মানুষের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রথমবার ব্যর্থ হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।

তাদের গুমরাহীতে ভীষণ কষ্ট পেলেন তিনি। ভেবেছিলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন-পথভোলা গ্রামের আপন মানুষকে তিনি পথের দিশা দেখাবেন। তাদের আবার ইসলামের আলোতে আলোকিত করবেন। কিন্তু পারলেন না তিনি। তার কথা কেউ শুনল না।

তারপর কি হলো নানা? হাসানের প্রশ্ন।

নানা বললেন, তারপর?

তারপর–

মুসলমানদের অধঃপতন দেখে আঁৎকে উঠলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।

অন্ধকার থেকে তাদের আলোর পথে তুলে আনার জন্য ব্যাপকভাবে দীনি দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন তিনি।

যাবতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করে ইসলামের খাঁটি অনুসারী হবার জন্য তিনি তার সংস্কার আন্দোলন চালাতে থাকলেন। সাধারণ মুসলমানকে নৈতিক শিক্ষায় তিনি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

অপরদিকে তিনি ইংরেজ এবং অত্যাচারী জমিদার হিন্দুদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ালেন।

এভাবে গর্জে উঠলেন সাহসী সৈনিক হাজী শরীয়তুল্লাহ।

দীর্ঘকাল মক্কায় থেকে হাজী শরীয়তুল্লাহ কেবল কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, তাসাউফই শেখেননি, তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ধর্ম, সমাজ-বিজ্ঞান

www.pathagar.com

ও রাজনীতি সম্পর্কেও। এ সময়ে তিনি বুঝলেন, ইসলাম কেবল একটি ধর্মের নামমাত্র নয় বরং একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম– ইসলাম।

ইসলামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হবার পর এর প্রচার এবং প্রসারের জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ নতুনভাবে উদ্যোগী হলেন। এক মহা আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে তিনি নিজের পথকে আবিষ্কার করলেন। আত্মত্যাগ ও আত্মকুরবানির শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন। এই দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন তিনি তার স্বগ্রামে। স্বদেশে।

কিন্তু কাজটি ছিল না খুব সহজসাধ্য।

কেন না তখনও চার পাশে অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অপসংস্কৃতির পঙ্কিলে হাবুডুবু খাচ্ছিল সাধারণ মুসলমান।

তখনকার সামাজিক অবস্থাটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

একদিকে চলছে ধর্মীয় অনাচার। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর আছে সাধারণ মুসলমানের ঘাড়ের ওপর ইংরেজ দস্যু, নীলকর ও অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের ক্ষিপ্ত চাবুক। আছে তাদের হাতে শাণিত তরবারি।

এর মধ্য দিয়েই হাজী শরীয়তুল্লাহ নতুনভাবে, নতুন উদ্যমে ঝড়ের মতো এগিয়ে চললেন ক্রমাগত সামনে।

সতেরো শ'চৌষট্টি সাল।

মীর কাসিমকে পরাজিত করল ইংরেজ দস্যুরা।

এরপর থেকে তারা মুসলমানদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো অনেক গুণে।

ইংরেজরা মুসলমানদের সব দিক দিয়ে ধ্বংস এবং নির্মূল করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিলো। মেতে উঠল তারা ঘৃণ্য-কুটিল ষড়যন্ত্রে।

ইংরেজরা আক্রমণ করল মুসলমানদের ধর্মের ওপর। তাদের অর্থনীতির ওপর। মুসলমানদের আয়মা, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হলো। তাদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের ভার ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে দিলো অনুগত হিন্দুদের হাতে।

আর এই সুযোগ পেয়ে চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

বহুদিন যাবত তারাও ওঁৎ পেতে ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। এমনি একটি মাধ্যম খোঁজ করছিল তারা যা দিয়ে বহুকালের শত্রু-মুসলমানদের তারা আরো বেশি করে শায়েস্তা করতে পারে।

www.pathagar.com

খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে হিন্দুরা চড়াও হলো মুসলমানদের ওপর। তাদের সাহসের মাত্রা বেড়ে গেল হাজার গুণে। খাজনা আদায়ের অজুহাতে কারণে অকারণে তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাতে থাকল অত্যন্ত নির্মমভাবে।

তাদের সেই নির্মম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এখনো শরীর শিউরে ওঠে ভাই! ভয়ে এবং আতঙ্ক কেঁপে ওঠে বুক।

মুসলমানদের অর্থ সম্পদ, জমি জায়গা ছলে বলে দখল করেও তৃপ্ত হতো না হিন্দুরা। শারীরিকভাবেও তারা নির্যাতন চালাত তাদের ওপর।

আর মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করা ছিল তাদের অন্যতম প্রধান কাজ।

অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় কোনো মুসলমান গরু কিংবা পশু কুরবানি দিতে পারত না। দিতে পারত না মসজিদে আযান। এমনকি ইসলামের অন্যান্য হুকুম-আহকামও পালন করতে পারত না স্বাধীনভাবে।

সব ক্ষেত্রেই বাধা দিত হিন্দু জমিদাররা।

জমিদারদের সাথে থাকত পশু স্বভাবের লাঠিয়াল বাহিনী। তারা মুসলমানদের ওপর যখন-তখন ঝাঁপিয়ে পড়ত বাঘের মতো।

হিন্দু জমিদাররা এ সময়ে মুসলমানদের দাড়ির ওপরও ট্যাক্স বসিয়ে দিলো। তাদের ধুতি পরতে বাধ্য করল। দাড়ি কেটে গোঁফ রাখতে নির্দেশ দিত। আর পূজার সময়ে মুসলমানদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করত চাঁদা, হাঁস-মুরগিসহ পূজার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র।

এছাড়াও তারা গরিব মুসলমানদের পূজার সময়ে খাটিয়ে নিত বিনা পারিশ্রমিকে। যারা তাদের অবাধ্য হতো তাদের ওপর চালাতো নির্মম নির্যাতন।

এভাবেই মুসলমানরা অর্থ এবং ধর্ম হারিয়ে হিন্দুদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছিল।

মুসলমানদের ঠিক এই চরম দুঃসময়ে মক্কা থেকে ফিরে এলেন আপন স্বদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ।

তিনি স্বদেশের বুকে পা রেখেই আঁৎকে উঠলেন।

চার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অবাক বিস্ময়ে।

দেখলেন হিন্দু-মুসলমানের আচার-আচরণ। তাদের এই আচার-আচরণের মধ্যে খুঁজে পেলেন না হিন্দু-মুসলমানদের মৌলিক পার্থক্যকারী ইসলামের সেই মহান আদর্শ।

www.pathagar.com

মুসলমানদের কাছে তিনি শুনলেন সকল দুর্ভাগ্যের কথা। শুনলেন ইংরেজ এবং হিন্দুদের অত্যাচারের কথা। নিজের চোখেও দেখলেন অনেক কিছু।

এসব দেখে আর শুনে ব্যথিত হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ।

ভাগ্যাহত মুসলমানদের অন্ধকারের কালো গুহা থেকে টেনে তোলবার জন্য তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন কঠিনভাবে।

হিন্দু ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তার সাহসী কণ্ঠ।

শুরু হলো তার দেশ, জাতি ও ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের দুর্বার সংগ্রাম।

হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সংগ্রামের নাম, এই আন্দোলনের নাম- 'ফরায়েজী আন্দোলন।'

হাজী শরীয়তুল্লাহ সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়ান। এভাবে ঘুরে ঘুরে তিনি সংগ্রহ করেন আপন সংগঠনের জন্য নিবেদিত কর্মী। সক্রিয় সদস্য।

হাজী শরীয়তুল্লাহ এই আন্দোলনের আগুনকে ছড়িয়ে দেন চার দিকে।

যারা ইসলামের ফরজসমূহ পালন করতে রাজি তারাই ফরায়েজী আন্দোলনের সদস্য হতে পারত।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিপুলসংখ্যক মুসলমানকে এই আন্দোলনের সদস্য করে তুলেছিলেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ তার সদস্য এবং সাধারণ মুসলমানকে ধর্মের সাথে কর্মের মিল রাখার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। আহ্বান জানালেন শিরক বিদয়াত থেকে দূরে থাকতে। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে নিজেদের জীবনযাত্রা পরিচালনা, আচার-অনুষ্ঠান পালন করার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন।

কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কুরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই ছিল বর্জনীয়। মহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ ছিল না, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

হিন্দুদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজেই গরু কুরবানি দিলেন।

www.pathagar.com

তারপর অন্যান্য মুসলমানকেও গরু কুরবানি দিতে বললেন। দাড়ির ওপর ট্যাক্স দিতেও মুসলমানদের কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আর শক্তভাবে নিষেধ করলেন হিন্দুদের পূজা পার্বণে চাঁদা বা পশু পাখি দিতে।

হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হলেন।

চার দিকে শুরু হয়ে গেল তুমুল আন্দোলন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর এই সাহসী আন্দোলন ছিল সত্যের পক্ষে আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

মুহূর্তেই ক্ষেপে গেল হিন্দু জমিদার এবং ইংরেজরা। চার দিকে শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ। সংঘর্ষ হলো তাদের সাথে।

কিন্তু পিছু হটল না ফরায়েজীর সিংহদিল কর্মীরা।

যতই বাধা আসতে থাকল, ততই বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকল ফরায়েজী আন্দোলনের তীব্র আগুন।

শত বাধার মুখেও হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন অনড় পর্বত।

আর তার সাথীরাও ছিল তেমনি সত্যের পথের এক একটি সিংহপুরুষ।—

এ পর্যন্ত বলে নানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, প্রকৃত অর্থেই হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন বাংলার মুসলমানদের জন্য এক সাহসী পুরুষ। তার সমগ্র জীবনটাই ছিল সংগ্রামের এক দীপ্রশিখা।

তিনি ছিলেন মুসলমানদের জন্য, সেই চরম দুঃসময়ে একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক। ছিলেন সত্যের সৈনিক।

তার হৃদয়ে ছিল ইসলামের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা। অঢেল প্রেম ছিল তার দেশের জন্য। মানুষের জন্য। আর তাই তাদের আঁধার থেকে আলোয় আনার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ সারাজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

আঠারো শ' চল্লিশ সাল। দিনটি ছিল আঠাশে জানুয়ারি।

দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটিয়ে এ বছর বিদায় নিলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। তার জন্মভূমি ফরিদপুরের শামাইলে ঘুমিয়ে আছেন তিনি।

সত্যিই কি ঘুমিয়ে আছেন?

না, এইতো শত বছর পরও আমাদের চেতনার দুয়ারে বারবার কড়া নেড়ে যাচ্ছেন একজন।

আমাদের সংগ্রামে, আমাদের জাগরণে, আমাদের অনুভবে এবং আমাদের চলার পথে তিনি আছেন সাহসের মশাল হাতে নিয়ে।

www.pathagar.com

হাজী শরীয়তুল্লাহ!

তার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষেরা মরেন না কখনো। তাদের কোনো মৃত্যু নেই। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেন তারা মানুষের চেতনায়। মানুষের ভালোবাসায়। মানুষের শ্রদ্ধায়। যেমন বেঁচে আছেন আমাদের সংগ্রামের উজ্জ্বল পুরুষ হাজী শরীয়তুল্লাহ।

আশ্চর্য! নানার স্মৃতিতে সন তারিখ সব কিছুই অম্লান হয়ে আছে।

হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবন-ইতিহাস শুনতে শুনতে মাহবুবসহ ওর বন্ধুদের মধ্যেও শরীয়তুল্লাহর মতো সাহসী সৈনিক হবার প্রেরণাটা জেগে উঠল। ওদের মধ্যে এই মুহূর্তে সত্য, সাহস আর ত্যাগ ও সংগ্রামের ইচ্ছাটা ক্রমশ উসকে উঠছে।

নানা একটা দম ফেলে বললেন, এবার যাও! রাত অনেক হয়েছে।

রাত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওদের আগ্রহে কোনো ভাটা পড়েনি। ওরা আরও শুনতে চায়। আরও জানতে চায়।

সত্য ইতিহাসের প্রতি ওদের আগ্রহ দেখে নানা দারুণ খুশি হলেন। ওদের চোখে-মুখে যেন একেকজন হাজী শরীয়তুল্লাহকেই তিনি দেখতে পেলেন।

নানার চোখ দু'টো আনন্দে চিক চিক করে উঠল।

পাঁচ.

সময়টা যে কিভাবে দ্রুত চলে যায়!

বর্ষা গেল, শরৎ গেল, হেমন্ত শেষে শীতও চলে এলো।

গ্রামে, শেষ রাতে এখনিই শীত অনুভূত হচ্ছে।

মায়েরা প্রয়োজনীয় লেপ-কাঁথার ভাঁজ ভাঙবেন কি ভাঙবেন না– এ নিয়ে শঙ্কায় আছেন।

বাঁকড়ার তিন পাশে বিল।

পশ্চিমে বিশাল কচুর বিল।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এদোর বিল, আর উত্তর-পূর্ব কোণে নোচুর কুড়।

বিল দুটিই মাহবুবদের বাড়ির কাছে। বিল কচুয়া যদিও একটু দূরে, কিন্তু নোচর কুড়টা বলতে গেলে তাদের উঠোন লাগোয়া। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত পেরুলেই বিল।

www.pathagar.com

বর্ষায় বিল তিনটি যেমন চারকূল প্লাবিত পানিতে সুন্দর দেখায়, ঠিক শীতের সময়ও দারুণ চমৎকার দেখায়।

বিলের আমনের ক্ষেতগুলো অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকে।

শীতের বিকালে, বিশেষ করে সন্ধ্যার আগে বিলের আমনের ক্ষেতগুলো অসম্ভব সুন্দর দেখায়।

সাদা হালকা কুয়াশায় ধানের পাতা ও ডগাগুলোকে মসৃণ করে তোলে। ধান গাছের ওপরটা এতই সমান দেখায় যেন মনে হবে বিলজুড়ে মাত্র একটিই ক্ষেত। সমান করে কোনো শিল্পী যেন কাঁচি দিয়ে ছেঁটেছে। মনে হবে একটি থালা এপাশ থেকে জোরে ছুড়লে থালাটি ধানের মাথার ওপর দিয়ে বিলের ওপাশে গিয়ে পড়বে। এমনই সমান দেখায় ধানের ক্ষেত।

সকালে শিশিরসিক্ত জমিগুলো আরও বেশি মনোরম ও কোমল দেখায়।

শীতের মধ্যেও ধানের ক্ষেতে পানি থাকে। বিলের মাঝখানে, নিচু ক্ষেতে বেশ কিছু কুয়া কাটা আছে। ধান ক্ষেতের মাছ যেন নিরাপদে কুয়ায় এসে জমা হতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

শীতের মৌসুম।

বাঁকড়া গ্রামটি আরও বেশি সবুজ হয়ে উঠেছে।

মাঠ ও বিলের বিকেলের দৃশ্য পাল্টে গেছে।

www.pathagar.com

বিকেল না হতেই সারা মাঠজুড়ে বাবুই, শালিক, ঘুঘু, দোয়েল, চড়ুইসহ নানা ধরনের পাখির কল-কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে।

খেজুর ও বাবলাগাছের শাখা-প্রশাখায় ডালপালায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বসছে আবার উড়ে যাচ্ছে।

কখনো বা এ মাঠ থেকে ও মাঠ, এগাছ থেকে ওগাছ।

পুকুর-পাড়ের তালগাছে চলছে বাবুই পাখির মহাউৎসব। তালগাছের এমন কোনো ডাঁটা-পাতা বাকি নেই, যেখানে তারা বাসা বাঁধেনি।

পাশের বড় দেবদারু গাছটি আরও মুখরিত অসংখ্য বাদুড়ের আনা-গোনায়। তাদের কিচিরমিচিরে, শব্দে পাড়ার বাড়িগুলোও সরব হয়ে উঠেছে।

মাহবুব তার বন্ধুদের নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে বেশ কিছু রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে দু'টো বিল।

পড়ন্ত বিকেল।

মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফিরে আসছে পাড়ার লোক। খেজুরগাছ কেটে খালি বাক হাতে নিয়ে, কাঁধ ও কোমরে দড়া ঝুলিয়ে, পেছনের ঠুঙ্গিতে ধারালো লম্বা দা নিয়ে দুর্বার গতিতে বাড়ি ফিরছে গাছিরা।

মাথার ওপর দিয়ে দলবেঁধে উড়ে যাচ্ছে বক, বাবুই, বাদুড়সহ অসংখ্য পাখি। বকের সুশৃঙ্খল লাইনের সমান্তরাল ঝাঁকটি সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর।

মাহবুব তার বন্ধুদের নিয়ে রাস্তার ধারে সবুজ মসৃণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল। এ সময় একটি বিশাল বকের ঝাঁক সমান ও সুশৃঙ্খল দল বেঁধে তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

মনে হলো বকের দলটি মাঠশিয়া কিংবা তারও পেছনের চাকলা-কাঁঠালতলার দিক থেকে উড়ে আসছে। তারা যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে। সম্ভবত ওদের আপাতত গন্তব্য কচুর বিল।

মাহবুব বসে বসে দেখছে বকের এই নান্দনিক ওড়ার ভঙ্গিটি। এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে বকের আর একটি বড় ঝাঁক উড়ে আসছে পুবের দিকে।

বকেরা কোথায় যায়, এখন তাদের দেখার পালা।

ওরা তাকিয়ে আছে অসংখ্য বকের দিকে।

বকের ঝাঁকটি আস্তে করে নেমে পড়ল নোচুর কুড়ে বিলের মাঝখানে, কুয়ার পাড়ে।

মাহবুবরা উঠে দাঁড়াল।

তাদের দৃষ্টি দুধেধোয়া সাদা বকের দিকে।

বকেরা ডানা নামিয়ে, ডাকতে ডাকতে কেবলই জায়গা বদল করছে।

www.pathagar.com

মাহবুবরা তন্ময় হয়ে দেখছে।

মাহবুব বন্ধুদের বলল, দেখ, সামান্য বকের মধ্যে কেমন বন্ধুত্ব এবং মিল। তারা মারামারি করছে না, ঝগড়া-বিবাদ করছে না। ঝাঁক বেঁধে এক বিল থেকে অন্য বিলে আসা-যাওয়া করছে। ওদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে কোনো মারামারি নেই। দেখলি তো কেমন সুশৃঙ্খলভাবে ওরা উড়ে গেল এবং এলো। এই একতাই কিন্তু ওদের বড় শক্তি এবং সাহস। আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ মুসলমানের মধ্যেও যদি একতা থাকতো তাহলে আজ মুসলমানেরা মার খেত না অন্য কোনো দেশ বা জাতির হাতে। সগৌরবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম।

হাসান বলল, ঠিকই বলেছিস। সামান্য পশু-পাখির মধ্যেও যে মিল ও একতা তার একাংশও আমাদের মধ্যে নেই।

সেলিম বলল, যাই বলিস না কেন, মুসলমানদের মধ্যেই সর্বপ্রথম একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করতে হবে। মামুন, আহমদ, আজিজও তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলালো।

মাহবুব বলল, একতার দৃষ্টান্ত কিন্তু আমরাই আমাদের মধ্যে চালু করতে পারি। আমরাই হবো প্রথমত আমাদের এই এলাকার মডেল। কি বলিস?

সবাই এক বাক্যে বলল, অবশ্যই। কোনো বাধা কিংবা ষড়যন্ত্রই আমাদের এই একতাকে পরাজিত করতে পারবে না।

মাহাবুব হেসে বলল, স্মরণ রাখিস আমাদের এই ওয়াদার কথা।

আজিজ বলল, অবশ্যই। নানার সেই কথাটা মনে আছে তো?

মামুন বলল, মনে নেই মানে? একশ'বার আছে। আমরাই হব ইনশাআল্লাহ একেকজন হাজী শরীয়তুল্লাহ।

মাহবুব আস্থার সাথে বলল, চেষ্টা করলে আমরাও পেরে যাব।

অন্য বন্ধুরা মাহবুবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, তাহলে পরস্পর হাত ধরো বন্ধু। এসো বলি এবং ওয়াদা করি-

আমরা আছি, থাকবো সদা সত্য পথে।
আমরা থাকব আলোর পথে।
আমরা আনব শান্তির সুবাতাস।
আমারা জাগাব আমাদের চারপাশ।
আমরা ছড়াব স্বপ্নের বীজ।
আমরা থাকব মানবতার অনুকূলে।
আমরা লড়ব মিথ্যার বিরুদ্ধে।
আমরা ভাঙব বাধার প্রাচীর।

www.pathagar.com

আমরা আনবই আলোর বন্যা।
আমরা আছি সাহসে ও সংগ্রামে।
আমরা জেগে থাকব এই বাংলায় অতন্দ্র প্রহরী। –
ওদের প্রত্যয়দীপ্ত আওয়াজ শেষ হতেই মসজিদ থেকে ভেসে এলো– হাই আলাস সালাহ।.....
মাহবুব বলল, ওঠ এবার। ডাক পড়েছে আল্লাহর।
মাহবুবসহ ওরা মসজিদে যাবার জন্য পা বাড়াল।
ওদের পদক্ষেপ শক্ত এবং প্রত্যয়দীপ্ত।
ওদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় এবং সুশৃঙ্খল।
পৃথিবীর আগামীকে জয় করার এক দুর্বার ইচ্ছা ও স্বপ্নের বাতাস ওদের বুক স্পর্শ করে গেল।
বাঁকড়ার নোচুর কুড় বিল থেকে এসময় শোনা গেল বালিহাঁসের কোয়াক কোয়াক হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া শব্দ।
মাহবুব বন্ধুদের বলল, ঐ দেখ, আমাদের স্বপ্ন এবং ইচ্ছাকে স্বাগত জান্নাচ্ছে বালিহাঁসের দল।
অন্যরা সোৎসাহে বলে উঠল,
অতএব সত্য থেকে আমাদের কে আর রুখবে বলো, কে? কার আছে হিম্মত!
বালিহাঁস তখনও ডেকে চলেছে তারস্বরে।
বালিহাঁসও সম্ভবত মাহবুবদের মতো বজ্রকঠিন শপথে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।
তা বটে। ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগাবার এইতো সঠিক সময়।
কালপ্রবাহ যেন বলছে হ্যাঁ, ডেকে যাও। ডেকে যাও বালিহাঁস অনন্তকাল।
জাগাও লক্ষ-কোটি মাহবুবকে।
ডাকতে থাকো ক্রমাগত।..... #

www.pathagar.com

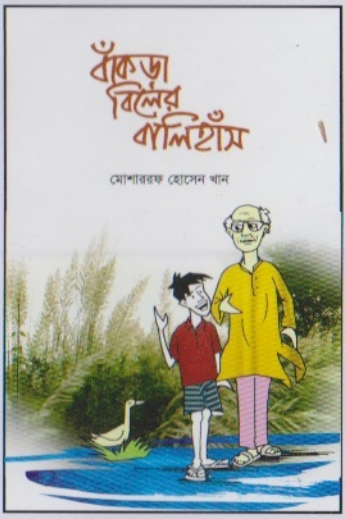

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম